Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture's
Volume – 3, Issue-II, published on April 2023, Page No. 276 – 283
Website: https://www.tirj.org.in, Mail ID: trisangamirj@gmail.com
e ISSN : 2583 – 0848

মল্লিকা সেনগুপ্তের কবিতা : শাশ্বত নারীর গাথা

জাহ্নবী ঝা
ইমেইল : signmyac@gmail.com

Keyword
মল্লিকা সেনগুপ্ত, নারীচেতনাবাদ, নারীবাদী কবিতা, আমি সিন্ধুর মেয়ে, বালিকা ও দুষ্টলোক।

Abstract

Discussion

পঞ্চাশের কবি বিনয় মজুমদার একবার বলেছিলেন, 'কবিতা প্রকৃতপক্ষে জননীরাই লেখেন।'[১] একথার সারবত্তা মেনে নিতে হয় এ জন্যেই যে, স্বদেশ ও বিদেশে কবিতার উৎস খুঁজতে গেলে দেখা যায়, মেয়েরা শিশুকে আদর জানাতে, ঘুম পাড়াতে যে গান গায় গাইত, ছড়া বলতো, সেটাই ছিল কবিতার আঁতুড়ঘর। যে রূপকথা শুনে শুনে আজও পুরোনো হয় নাই, সেখানে গৃহবন্দী ও স্বামীর শাসনে, সমাজের অনুশাসনে বাঁধা অসহায় নারীর আকুলতা কি দেখি না? রাক্ষস বা দেত্যপুরী থেকে রাজকন্যার মুক্তিবাসনা, লালকমল-নীল কমলের জন্য মায়ের আশার মধ্যে নারীর যন্ত্রনা ও স্বপ্নই খুঁজে পাই। মনে হয়, আমাদের ছেলেভোলানো ছড়ার মধ্যে নারীচেতনাবাদের বীজ ও নারীবাদী কবিতার সূত্র খুঁজে পাওয়া সম্ভব।

মল্লিকা সেনগুপ্ত শুধু নিজের জন্য কবিতা লেখেননি, শুধু নিজের কথা ভাবেননি, আদিকাল থেকে সমূহ নারীশক্তির প্রতিভূ হয়ে কথা বলেছেন। নারীদের স্বপ্ন, প্রতিবাদ, তাদের অধিকার ও স্বাধীনতার আকাঙ্খা-ই কণ্ঠস্বর হয়ে বেজেছে মল্লিকার কবিতায়। কোথাও উগ্রতা নেই, রক্তচক্ষু নেই, অন্ধ আবেগ নেই, আছে প্রাণের প্রতিভাস। সভ্যতার আদিকাল থেকে বীজ বোনা, ঘর বাঁধা, শিল্প নির্মাণ সবেতেই অতীত প্রাণের ঐশ্বর্য দেখতে পেয়েছেন। তিনিও যে সেই মানবীদের মধ্যে বিরাজ করেছেন তারপর বর্তমানেও বিস্তৃত হয়ে আছেন - বোধের বিস্তৃত ব্যাপ্তি আমরা মল্লিকার কাছেই পাই। তাই তাঁর কবিতাকে শুধু নারীবাদীর আলোকে বিচার করলে পক্ষপাতিত্ব করা হবে। কেননা, নারী মহিমার সঙ্গে প্রকৃতির সম্পর্ক, সভ্যতার সম্পর্ক। সভ্যতা কতখানি গভীর ও চিরন্তন, মানবীয় পৃথিবী গড়ার পক্ষে কতখানি অপরিহার্য তা বলার অপেক্ষা রাখে না। মল্লিকা নিজের আত্মগত উত্থানের ব্যাপ্তিকে জানাতে গিয়ে 'আমি সিন্ধুর মেয়ে' কাব্যে লিখেছেন -

"সিন্ধুদ্রাবিড় মাটি আমার শিকড়
আমারই নগরীর নারী ও পুরুষ
পৃথিবীর গর্ভ খুঁড়ে ধাতু বানিয়েছি।"[২] (সিন্ধুদ্রাবিড়)

একজন নারী ও পুরুষ যখন কবিতায় আসেন, খুব প্রাকৃতিক ভাবেই তাঁদের কাব্যিক পরিসর স্বতন্ত্র হয়। নারী ও পুরুষ উভয়েই একটিমাত্র প্রজাতির অন্তর্ভুক্ত - মানব প্রজাতি। কিন্তু তাঁরা একই প্রাণী নন। শুধুমাত্র জেনেটিক কোড আলাদা হওয়ার কারণেই মানুষ মানব হয়েছে, আর গোলাপ হয়েছে গোলাপগাছ। তাদের ক্রোমজম সংখ্যা এবং বিন্যাসগতভাবে একই নয় - তাই মানুষ গোলাপের মতো ফোটে না, নীল তিমির মতো রাজত্ব করে না সমুদ্রে। নারী এবং পুরুষের জেনেটিক কোড আলাদা। তার প্রভাব শুধু জীববিদ্যায় আটকে থাকে না, সকল ক্ষেত্রেই দেখা দেয়। ভাষা ব্যবহার তো বটেই। হয়তো বলা চলে ভাষার ক্ষেত্রে নারী এবং পুরুষের স্বাতন্ত্র্য সব চেয়ে স্পস্ট হয়ে দেখা দেয়। স্বাতন্ত্র্য বলছি, বৈষম্য বলছি না। স্বাতন্ত্রের কোনো মাপকাঠি হয় না, বৈষম্য পরনির্ভর, যাচাই নির্ভর। নারীর কবিতায় মানব প্রজাতির প্রকাশ যেমন থাকবে, কিছু দিক এমন থাকবে যা পুরুষের নাগালের বাইরে - পুরুষ যা বলতে পারে না, বুঝতে পারে না। এ এক অনপনেয় সাংস্কৃতিক ছাপ, পুরুষ যা অনিবার্য কথা বলেন কবিতায়। যে কোনো নারীকেই এখানে হয়ে উঠতে হয় - কথামানবী। তিনি এক ছাপ, সংস্কৃতির বুকে। 'কথামানবী'-র পুরোটা জুড়ে পিতৃতান্ত্রিক প্রতাপের পাশে কবি প্রতীকী নারীমুক্তির একটি অবয়ব নির্মাণ করতে চেয়েছেন। 'কথামানবী'-র গদ্যাংশে তিনি জানিয়েছেন -

> "হ্যাঁ, আমি কথামানবী। ঋগ্বেদ থেকে একুশ শতক পর্যন্ত আমার বিচরণকাল। ইতিহাসের ছাই এবং ভস্মের মধ্যে নারী নামক যে আগুন চাপা পড়ে আছে, আমি তারই ভাষ্যকর। আমি আগুনের আত্মকথন। আমি কান্না পড়ি, আগুন লিখি, নিগ্রহ দেখি, অঙ্গার খাই, লাঞ্ছিত হই। এই আগুন বেদনার প্রতিবাদের, আত্মমর্যাদার ও ভালোবাসারও। আগুন মরে গেলে মানুষ মরে যায়। আগুনের কথাকারকে মনু সহজে মেনে নিতে পারে না। আমাকেও পারে না।"[৩]

এই কবিতার নির্মাণ প্রসঙ্গে বললেন,

> "শৌর্যবীর্যের গল্পে ভরা ইতিহাস বইয়ের তলায় মেয়েদের যে গহন কাহিনি চাপা পড়ে আছে কথামানবী তারই ভাষ্যকার। কথামানবী সেই নারী যে যুগান্তরের অপমান ও আর অবহেলার পরেও ভালোবাসতে পারে, প্রতিবাদ করতে পারে, যে নতুন জন্ম নিয়ে ফিরে ফিরে আসে দ্রৌপদী, গঙ্গা, সুলতানা, রিজিয়া ... মেধা পাটকর, ... শাহবানু বা খনার মধ্যে দিয়ে যে হেঁটে চলে যুগ থেকে যুগান্তরে, মিশে থাকে প্রতিটি ভারত কন্যার রক্তে, যে ইতিহাস এবং অনাগত, একক এবং রহস্য, অশ্রু এবং আগুন, যার শুরু আছে কিন্তু শেষ কোথায় নিজেও জানে না।"[৪]

মল্লিকা সেনগুপ্তের একটি চর্চিত কাব্যগ্রন্থ হল 'পুরুষকে লেখা চিঠি' (২০০২) কাব্যের নামকরণের মধ্যে দিয়েই বোঝা যায় কিছু একটা বলার তার আছে। আরেকটা কথা এই পর্বে এসে দেখা গেছে প্রতিবাদ বা অসহায়তা বর্ননা নারীর নিজস্ব ভাষা, নতুন আকাশ খোঁজার দিকে তিনি চলেছেন। 'অলকানন্দা এমনি একটি কবিতা -

"মেয়েটির নাম অলকানন্দা গিরি
নামের বানান শিখবে সে শিগগিরি।
রাত্তিরবেলা লণ্ঠন হাতে
মেয়েটি চলেছে পাঠ্যশালাতে
বয়স্ক ইস্কুলের রাস্তা

. . .

রাস্তার ধারে কারা যেন ডানপিটে
বর ছেড়ে গেছে, চিঠিও লেখে না
... রাস্তাটা বড় পিছল অন্ধকার
তবু সে শিখবে অ আ ক খ আর
পাটি গনিতের যত সম্ভার
পালানো বরকে চিঠি দেবে শিগগিরই
মেয়েটির নাম অলকানন্দা গিরি।'[৫]

তাঁর সমাজতত্বের পাঠ কি তাঁর প্রথম থেকেই নারীদের অবয়ব কবিতায় গাঁথতে প্রনোদিত করেছে? কিছুটা ঘোষনাকে জাগরণশীল রাখার উদ্দীপনা জুগিয়েছে? তাই যদি হয়, আমরা দেখব নারী অবস্থানের দ্বন্দ্ব কীভাবে সক্ষমতার কাছে

দ্রুত সংবেদনায় গেঁথে উঠেছে, কীভাবে সমাজের নানা কোণের নারী মানসের বিপর্যয় আর পুরুষের রচিত চক্রব্যূহের ভেতর থেকে প্রতিপ্রশ্নের স্বকীয় কণ্ঠ জন্ম নিতে চাইছে।

মল্লিকা সেনগুপ্ত তাঁর এভাবে কবিতা লেখার কারণও আমাদের হাতে ধরিয়ে দিয়েছেন। বলেছেন,

"আমার কবিতা আলোর চাতক, অন্ধকারের মুনিয়া
আমার কবিতা ছোট পরিবার, বাইরে বিরাট দুনিয়া
কবিতা আমার ঘর সংসার।"[৬]

(আমার কবিতা আগুনের খোঁজে।)

তাঁর পূর্ববর্তী কবি দেবারতি মিত্র-র আকুলতা যেন এইসব পংক্তিতে। দেবারতি মিত্র তাঁর কবিতা লেখালেখি সম্বন্ধে বলেছিলেন, তখন পৃথিবী ছিদ্রহীন লোহার ঢাকনার মতো আমাকে চাপা দিয়ে রেখেছিল - সেই বিষাক্ত বাষ্প, অন্ধকার, উপায়হীন অশ্রুতে অনেক কবিতাই শোকগ্রস্ত। কিন্তু এ-ও সত্যি ঐ সভয়ের লোহার ঢাকনা ফুটো করে এক ঝলক আঁকুবাঁকু অস্ফুট হওয়া এসেছিল নিঃশ্বাস বায়ুর মতো।

ভাবা যেতে পারে কবিতা উভয়ের কাছে নিজেদের তৈরি নিজেদের বসবাসের জন্য এক নতুন জগৎ, যা মল্লিকা সেনগুপ্তের কলমে একটু বেশি নারী পরিসর গ্রহণ করে, একটু বেশি বেপরোয়া, একটু বেশি পরিস্রোতের সুলুক সন্ধান, তা সমকালীনতার নির্দেশেই।

মল্লিকা সেনগুপ্ত পুরুষতান্ত্রিক সমাজের বিরোধিতা করেও ভালোবাসা ভুলে যেতে চাননি। আর তো কিছুটা হলেও পাশ্চাত্যের নারী লিখনের থেকে কিছুটা নম্র। তা বাংলা ভাষা ও জাতির মৌলিকতাকে চিহ্নিতে করে! সিলভিয়া প্লাথের তো তাঁর বিখ্যাত 'পর্দা' কবিতায় খাঁচায় বন্দী সিংহী-র মতো প্রতিশোধ স্পৃহার গমগম ধ্বনি প্রকাশ পায়। কিন্তু মল্লিকা সেখানে পুরুষের কাছে আত্ম অবমাননার কৈফিয়ৎ চাইছেন মাত্র।

"পুরষ, আমি তো কখনও তোমার বিরুদ্ধে হাত তুলিনি
প্রথম যেদিন সীমান্ত চিরে রক্ত দিয়েছ
আমার সে দিন ব্যথা লেগেছিল, বলিনি তোমাকে বলিনি
রুক্ষ মাটিতে ফোটে না গোলাপ ময়ূর পেখম তোলে না
তবু চিরদিন বালুচর খুঁজে পানীয় তুলেছি আমরা
ছেলে কোলে করে জোনাকি দেখেছি, চিনিয়েছি কালপুরুষ ..."[৭] (রক্তচিহ্ন)

রামায়নের Feminist version 'সীতায়ন' লিখতে গিয়ে মল্লিকা পুরুষ ও প্রাতিষ্ঠানিক নিপীড়নের আদি অংশ ধরে টান দিলেন, ভারতীয় সভ্যতা সংস্কৃতির শেকড়ে যে পুরুষ আধিপত্যের নগ্ন অন্তর্জাল বেছানো, যার প্রতিভূ স্বয়ং রামচন্দ্র, যার অদেহী অস্তিত্ব নিয়ে একুশ শতকের সমাজ - সংসার - রাজনীতি নিয়ন্ত্রিত, তাকেই পিতৃতন্ত্রের ফ্যাসীবাদী মুখ দিলেন। গোটা প্রাচ্যের নিপীড়িত মেয়ের প্রতিভূ সীতা কবির স্বরন্যাসের অবলম্বন এখানে। রাজার প্রজানুরঞ্জন লক্ষ্যকে আমরা অনায়াসে প্রাতিষ্ঠানিক প্রতীতি ধরে নিতে পারি। ভারতীয় মেয়েদের অসহায়ত্বের উন্মোচন এই সীতায়ন উপন্যাসের কয়েকটি লাইন সামনে রেখতে হচ্ছে কবি মল্লিকা সেনগুপ্তের চিন্তরের বিশেষ, তাঁর সামান্য দোদুল্যমানতার তাৎপর্য ও সঙ্গতি। তিনি লিখেছেন,

> "তাঁর মনে পড়েছিল বাল্মীকির প্রথম সাক্ষাৎ। প্রথম দর্শনেই তাঁকে অতি আপনজন মনে হয়েছিল। বাল্মীকিও বিস্মিত হয়ছিলেন রাম-লক্ষণের অনুবর্তী সীতাকে দেখে। বলেছিলেন স্বেচ্ছায় রাজসুখ ছেড়ে বনে-জঙ্গলে স্বামীর সঙ্গিনী হওয়ার এইরূপ উদাহারণ তিনি কোনো ক্ষত্রিয় রমনীর মধ্যে পূর্বে দেখেননি। যে বাল্মীকি তারপর নিকটবর্তী পর্ণকুটিরেও দিনের পর দিন তাঁকে দেখেছেন স্বামীর অতি সোহাগিনী, দেবের সেবা গ্রহণে অভ্যস্ত এক পরম সুখী নারী হিসেবে, যাঁকে বহুদিন সীতা গর্ব করে বলেছেন তাঁর বিরল- সৌভাগ্যের কথা, আজ কোন মুখে সেই বাল্মীকির সামনে গিয়ে দাঁড়াবেন তিনি। মুখোমুখী হলেই তো বলতে হবে অন্তঃসত্ত্বা রাজসিংহাসন রক্ষা করতে ত্যাগ করেছেন রামচন্দ্র, সেই শ্রীরাম বৃক্ষের তলায় দাঁড়িয়ে বলেছিলেন, বৈদেহী আমার এই ঊষর বনবাস তুমিই একমাত্র মরুদ্যান।"[৮]

মানবিতকার কথা অনেক হয়েছে, কিন্তু পুরুষ শাসিত সমাজের পরিবর্তন হয়নি, তাই মানবীকথার মধ্য দিয়েই অনেক প্রশ্ন ও তর্কবিতর্ক ছুঁড়ে দিয়েছেন মল্লিকা। মার্কসীয় তত্ত্বে 'শ্রম' কথাটার বহু তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা রয়েছে। কিন্তু 'গৃহশ্রম' সম্পর্কে কিছুই বলা হয়নি। নারী সারাজীবন গৃহশ্রমেই জীবন অতিবাহিত করে চলেছে। যদিও মার্কস 'লিঙ্গ' নির্ণয় করে তাঁর তত্ত্বের ব্যাখ্যা দেননি। কিন্তু 'লিঙ্গ' অস্বীকারই বা করা যায় কী করে? 'অর্ধেক পৃথিবী' কাব্যের 'আপনি বলুন, মার্কস' কবিতায় লিঙ্গ বৈষম্যের এই ধারনাটি তুলেই মার্কসকে প্রশ্ন করেছেন -

"ছড়া যে বানিয়েছিল, কাঁথা বুনেছিল
দ্রাবিড় যে মেয়ে এসে গম বোনা শুরু করেছিল
আর্যপুরুষের ক্ষেতে, যে লালন করেছিল শিশু
সে যদি শ্রমিক নয়, শ্রম কাকে বলে?
আপনি বলুন মার্কস, কে শ্রমিক, কে শ্রমিক নয়
নতুন যন্ত্রের যারা মাসমাইনের কারিগর
শুধু তারা শ্রম করে!
শিল্প যুগ যাকে বস্তি উপহার দিল
সেই শ্রমিক গৃহিনী
প্রতিদিন জল তোলে, ঘর মোছে, খাবার বানায়
হাড়ভাঙ্গা খাটুনির শেষে রাত হলে...
সেও কি শ্রমিক নয়!"[৯]

গৃহশ্রমের মজুরি হয় না, ঘরে ঘরে মেয়েরা বিপ্লবীর ভাত রেঁধে দেয়, কমরেড শুধু কাস্তে হাতুড়ি নিয়ে পৃথিবীতে শ্রেণীহীন শোষণহীন স্বর্গরাজ্য বানাবে - তাহলে মেয়েরা কি বিপ্লবীর সেবাদাসী হবে? এই মারাত্বক প্রশ্নটি বাংলা কবিতায় মল্লিকাই একমাত্র সংযোজন করেছেন। প্রতিবাদই শুধু নয়, সমাজের কাছে উত্তরও চেয়েছেন, তর্কও তুলেছেন, বিশ্লেষণও করেছেন। নারী সত্তার জাগরণ তো এখানেই। তারও স্বাধীনভাবে বাঁচার ইচ্ছে আছে। উড়ার ইচ্ছে আছে, ভালোবাসার ইচ্ছে আছে -

"দেখো, আমিও মানুষ
আমিও তরুনী আজও
আমারও জঙ্গল ভাল লাগে।"[১০]

(পাখির সঙ্গে)

কাঁচের সভ্রান্ত ঘরে ঢিল মেরে সবকিছু এলোমেলো করে জীবনের প্রত্যয় ও স্বপ্ন, আনন্দ ও আন্দোলনকে, ভালো লাগা ও চঞ্চলতাকে তুলে ধরতে চান। কলেজে পড়ানোর কাজ ছেড়ে গুজরাটি গ্রামে গিয়ে চনমনে ছটফটে জীবন কাটাতে চান। এই 'ইচ্ছে'টিই মল্লিকার কবিতাকে আলাদা করেছে। নারীবাদের অন্ধকার থেকে রৌদ্রস্নাত পথে মানবীকথার শাশ্বত বোধিতে উন্নত করেছে।

'পুরুষকে লেখা চিঠি' (২০০২) কাব্যে ২০০১ সালের আগস্ট মাসে সংবাদপত্রে 'বালিকাকে যৌন হেনস্থার দায়ে স্কুল বাসের ড্রাইভার ও হেল্পার ধৃত' শিরোনামে খবর পাঠ করে লেখেন 'বালিকা ও দুষ্টলোক' কবিতাটি। পুরুষ কাকু, পুরুষ দাদু, পুরুষ মামা, পুরুষ ভাইরা কী ভাবে বাচ্চা মেয়েদেরও যৌন হেনস্থা করে সেটারই একটা উদাহারণ এই কবিতাটি।

"স্কুলবাসের বাচ্চা মেয়ে
সবার শেষে নামে
সঙ্গীগুলো বিদায় নিলে
তার কেন গা ঘামে।
বাসের কাকা বাসের চাচা কেমন যেন করে
হঠাৎ গাড়ি থামিয়ে দিয়ে

আমায় নিয়ে পড়ে
কাকু জ্যেঠুর মতন নয়
দুষ্টুলোক ওরা মাগো আমার বাস ছাড়িয়ে
দাওনা শাদা ঘোড়া!"[১১]

বাচ্চা মেয়ের সঙ্গে অসভ্যতা করা এই দুষ্টু লোকদের বিবরণ খুব সহজ ভাষাতেই তুলে ধরেছেন। কবিতাটি শিশুদেরও পাঠ্য হয়ে উঠতে পারে। যা সত্য, যা প্রতিবাদের যোগ্য, যা নিজেকে টিকিয়ে রাখার লড়াই মানবীকথা তো তাই-ই। তাকেই কবিতায় রূপ দিয়েছেন। অবশ্য পরিনত ভাবনায় গদ্য রচনাগুলিও তীক্ষ্ণ ইস্পাতের মতো মেধাবী ও শাশ্বত আবেদনে অমোঘ হয়ে উঠেছে। 'স্ত্রী লিঙ্গ নির্মাণ' এবং 'সীতায়ন' এই ভাবনারই তাৎপর্যপূর্ণ প্রকাশ। 'ফ্রয়েডকে খোলা চিঠি' লিখেও প্রশ্ন তোলেন - নারীকে কেন একটি অঙ্গের অভাবে আলাদা করা হল? তেমনি 'ছেলেকে হিষ্ট্রি পড়াতে গিয়ে' (২০০৫) কাব্যের নাম কবিতাতেই লিখেছেন সেই পুরুষের এক পক্ষের ইতিহাস, প্রকৃত ইতিহাস কোথায়?

"পূর্ব পুরুষেরা একা, একা একা উত্তর পুরুষ
উত্তর মানুষ নেই, পূর্বনারী নেই আমাদের;
হিষ্ট্রি তো শৌর্যবির্যে ভরা 'হিজ স্টোরি'
আমরা বুঝেছি নারী ছিল না তখন;"[১২]

পুরুষ শাসিত সমাজে পুরুষেরই জয় জয়কার। তাই পুরুষকে কেন্দ্র করেই আবর্তিত হয়েছে ইতিহাস। নারী সেখানে বর্জিত, উপেক্ষিত এবং একেবারে পরিত্যজ্য হয়েছে।

'ম্যানমেড' সভ্যতায় কোথাও নারী নেই। সৃষ্টির আধার নারীর এই উপেক্ষা নিয়েই সরব হয়েছেন মল্লিকা। শ্লেষ ছুঁড়ে দিয়েছেন নপুংশক ইতিহাসবিদের দিকে - 'পুরুষ জননী ছিল পুরুষ জনক'। কবিতাটি বিদ্ধ করেছে এই সমাজকে। আমাদের ইতিহাসকে। রাগ, প্রতিবাদ, বিদ্রুপ সবই এসে ভিড় করেছে কবির কণ্ঠে। সমাজের এই পক্ষপিতিত্বকে জটিলতাহীন, সংকেতহীন একেবারে আক্রমণাত্মক ভাবেই পরিবেশন করেছেন।

সময়ের সাথে সাথে নারীরও পরিবর্তন ঘটেছে, কোনও পুরুষের উপরই তাকে আর নির্ভর করতে হয় না, বরং সে-ই পুরুষকে রক্ষা করে। এরকম শ্রেণীর একটি কবিতা 'বীর পুরুষের মা'। রবীন্দ্রনাথের 'বীরপুরুষ' কবিতার শিশুটি কাল্পনিক ডাকাতদের নিজ বীরত্বে মেরে তাড়িয়ে দেয় এবং তার মাকে রক্ষা করে, কিন্তু মল্লিকার বীর পুরুষের মা বলে -

"মনে কর যেন বিদেশ ঘুরে
খোকাকে নিয়ে যাচ্ছি অনেক দূরে
একলা মা আর একলা ছেলে
ডাকাতগুলো দেখতে পেলে
কী হবে বল্ বীর পুরুষ খোকা?
তুই করবি যুদ্ধ, আর আমি রইব বোকা!
স্পষ্ট বলছি তা হবে না আর
তুই ওদের তির ছুঁড়লে আমিও দেব মার।
১০০ বছর পার করে 'মা' বদলে গেছে, রোরো
এখন মায়ের পিঠে চড়েই দেশবিদেশে ঘোরো।"[১৩]

একটি অন্যরকম কবিতা 'রেড লাইট নাচ'। একদিন মধুসূদন মঞ্চে ১০ - ১২ জন কিশোরী যাদের জন্ম সোনাগাছিতে, যারা বেশিদিন বাঁচবে না তারা মল্লিকার কবিতা পাঠ করে একটি কোলাজ পরিবেশন করল। এদের ঘিরেই এই কবিতা-

"গঙ্গা মল্লিকা এই মঞ্চে এসে কী আশ্চর্য কবিতা বলছে!
কথামানবীর কণ্ঠে শাহবানু, বেহুলা, দ্রৌপদী
কী ভাবে গঙ্গার মধ্যে সব একাকার!
বালিকা বয়সে ওর কাকা ওকে নিয়মিত ধর্ষণ করত

দগদগে ক্ষত নিয়ে কথামানবীর মঞ্চে এখন সে বাঁচতে এসেছে
বীণা গঙ্গা বেবি বা সালমা, ফুটফুটে এই কিশোরীরা
যে কেউ আমার ছাত্রী হয়ে ব্যাগ কাঁধে এসে দাঁড়াতে পারত
মহারানি কাশীশ্বরী কলেজের দরজায় ...
ঊবর্শীর মেয়েগুলি আমাদের পৃথিবীতে বাঁচতে চাইছে।"[১৪]

অদ্ভুত এক জীবন দেখানোর চেষ্টা করেছেন কবি। আগুন মরে গেলে মানুষ মরে যায়। আগুনের কথাকারকে মানুষ সহজে মেনে নিতে পারে না। মেয়েদের মুখ থেকে কঠিন কথা শুনতে অনেকে অস্বস্তিতে পড়েন। এই আগুনের আত্মকথন লিখতেই ইতিহাস পুরাণে কবির মনন ভ্রমন। তাই অতীত বর্তমানকে একই সূত্রে গ্রন্থন এবং সমূহ নারী সত্তাকে আত্মজাগরণের আলোয় উদঘাটন করেছেন।

প্রকৃত কবিতা তো পুরুষের ঊর্ধ্বে, সময়ের ঊর্ধ্বে মানুষের জয়গান। মল্লিকা নারীর কথা বললেও পুরুষকে হেয় করতে চাননি। পুরুষের হাত ধরেই অগ্রসর হতে চেয়েছেন। এরই মধ্যে 'মেয়েটা' কবিতায় তিনি বলছেন -

"মেয়েটা ছুঁতে চায় আকাশ পৃথিবীকে।"
তিনি 'কাব্যপুরুষ' কবিতায় বলেছেন বলছেন,
"কবিতা লেখাটা বুঝি শুধুমাত্র পুরুষের কাজ!
কাব্যপুরুষ তোকে এবার পরাব অন্য সাজ।"[১৫]

'ও জানেমন জীবনানন্দ, বনলতা সেন লিখছি' (২০০৮) কাব্যের একটি কবিতা 'ধর্ষণের ঋতু'। যেখানে ঘটনার মধ্য দিয়ে নারীর হত্যার কথা এসেছে। সাতাশে মাঘ, রাস্তা শুনশান কণিকা মন্ডল ও সুনিতা মন্ডল মা ও মেয়ে দানা তুলেছিল খেসারি খেত থেকে। সতেরো বছরের সুনীতা খেত থেকে বাড়ি গিয়েছিল জল আনতে টিউবওয়েল। পরনে ফুলছাপ খয়েরি সালোয়ার এরপর কেউ তাকে দেখতে পায়নি। বাবলা গাছে তার ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার হয়েছিল। কোমোরে জঙ্ঘায় ছিল রক্তের দাগ। ছিন্ন সালোয়ারও ছিল খয়েরি লালে লাল।

এরপরে যা ঘটল, তা প্রায় সকলেরই জানা। ধর্ষিতার নাম মুছে গেল মানুষের মন থেকে। সুনীতা মণ্ডল, তাপসী মালিকেরা রাজনীতির ফাঁদে হারিয়ে গেল। ধর্ষকরা শাস্তি না পেয়েই ঘুরে বেড়ালো। এই ঘটনা হামেশায় ঘটছে। কিন্তু এভাবে চোখে আঙুল দিয়ে দেখানোর সাহস একমাত্র কবিই করতে পারেন। কবিতা কীভাবে অ্যাক্টি ভিস্ট-এর হাতিয়ার এখানেও যেন তিনি দেখাচ্ছেন। গ্রাম বাঙলার মেয়েদের অসহায়তার সুযোগ নিয়ে কিভাবে ধর্ষকদল রাজত্ব করে আর নারীকে মেরে ফেলা হয় তার জ্বলন্ত বর্ণনা দিয়েছেন তিনি। একই ঘটনা দেখা যায় মালতী মুদির ক্ষেত্রেও। মালতীর মতো একটা প্রান্তিক মেয়ে, সে কিনা পুলিশে ডায়েরি করেছিল বড়বাবুর নামে। বড়বাবু তার শ্লীলতাহানী করেছে। পুলিশ বলল, 'ও কিছু না, গায়ে হাত দিয়েছে, অন্য কিছু তো করেনি, ডিয়েরি তুলে নে'। মালতী বলল, 'না'। পাড়ার লোকেরা প্রথমে তাঁর সঙ্গে ছিল। পরে পার্টির চাপে বললো, ' ডায়েরি তুলেনে। মালতী বলল, 'না'। মালতীর বাবা এত তারিফ করেছিল মেয়ের সাহসকে, সেই বাবাও গেল বেঁকে বলল, 'তুলে নাও'। মালতী বললো, 'না'। ঝড় উঠল সারাদেশে।

'মেধাজন্ম' কথায় নর্মদার সাথে মেধার তুলনা করেছেন। সারা পৃথিবীতে যত সবুজের আন্দোলন তার সিংহভাগ জুড়ে আছে মেয়েরা। আমরা মেয়েরা তো কোনদিন কুঠার হাতে গাছ কিটিনি। নদীকে আঁকড়ে ধরেও বেঁচে থাকে আমাদের কেউ কেউ। যেমন—

"ভারতবর্ষে
যত নদী আছে
যত গাছ আছে
নদীর দুধরে
. . .
তাদের সবার
একটি প্রেরণা

একটি লড়াই
মেধা পাটেকর।"[১৬]

এই কাব্যের শেষ অংশ 'খনাজন্ম' কথায় খনার কথা দিয়ে নারীর অসহায়তা তুলে ধরেছেন। নিষ্ঠুর সমাজ যার জিভ কেটে নেয় সত্য বলার অপরাধে-

"আমাদের নারীজিহ্বা
মাঠে পড়ে আজও কাঁদছে।"[১৭]

আগুনের পথেই হাঁটছেন মল্লিকা; আদিগন্ত ভস্মরাশি থেকে নতুন মেয়েদের উঠে দাঁড়ানোর কথকতা করে যাচ্ছেন নিরবিচ্ছিন্নভাবে। বাচন ও ভাবনার দ্বিরালাপ নিয়ে অব্যাহত রয়েছে তাঁর নিরীক্ষা। 'ইতিহাস পুরুষ নির্মিত' - এমনটাই মত নারীবাদী তাত্ত্বিকদের। তাঁরা বলেন, ইতিহাস আসলে পুরুষদের ইতিহাস। মল্লিকা উগরে দিলেন নারীকে অন্ধকারে ঠেলে দিয়েছে যে ইতাহাস তার প্রতি রাগ ও বিদ্রুপ। আশ্চর্য দক্ষতায় মল্লিকা তর্ক, রাগ, বিদ্রুপ, প্রতিবাদ সবকিছুকেই শেষমেষ কবিতা বানিয়ে ফেলতে পারেন। আসলে তিনি জানেন কোথায় থামতে হয়।

সত্যি বলতে কেবল 'ইতিহাস' নয় সাহিত্য ও পরিচিত মিথের পূনর্লিখনও গোটা বিশ্বজুড়েই নারীবাদী লেখকদের অত্যন্ত পছন্দের কাজ। মল্লিকা সেনগুপ্ত একাজ করেছেন। ইতিহাসের বাইরে, পুরানের বাইরে ক্লাসিক হয়ে যাওয়া বাংলা কবিতাকেও নিজের মতো করে লিখে নিয়ে বুঝিয়েছেন ইতিহাসের মতো, সাহিত্যও আসলে পুরুষ নির্মিত।

ইতিহাসকে প্রায়ই মল্লিকা দেখেছেন পুরুষের যুদ্ধচর্চার ইতিহাসরূপে। নারী চেয়েছে শান্তি, আর ইতিহাস তোলপাড় করে। তাই তো তিনি বলেছেন—

"অস্ত্র ফিরিয়ে নাও হে রাজপুরুষ'। (অস্ত্রপুরুষ)
অস্ত্রপুরুষের প্রতি এই অন্যত্র রূপ পেয়েছে 'যুদ্ধ' কবিতায় -
"পুরুষ তুমি কেন যুদ্ধ ভালোবাসো!
বানিয়েছিলে কেন বর্ষা বল্লম।
. . .
শিশুকে ভালোবাসো, আমাকে ভালোবাসো।"[১৮]

এ এক অলিখিত আর্তি আমরা অনুভব করি।

'আমি আর জুলেখা ডবসন', 'মা', 'ভানুদাদা', 'মিলেনিয়ার', 'একশো আলোক বছরে', 'আমার বাড়ি' 'দেওয়ালির রাত' এই প্রক্রিয়ার নানা বিভঙ্গ। পরবর্তী সংকলন 'পুরুষকে লেখা চিঠির' কবিতাগুলিতেও লক্ষ্য করি নারী-পরিসর ও নারীর ভাষাবিশ্বের আর্থ- সামাজিক ও রাজনৈতিক ভিত্তি আর চিহ্নায়নের অবিরল খনন। 'আলকানন্দা', 'চাতক', 'গোলাপ মরশুমে', 'ফুলনদেবীর কথা', 'রেডলাইট নাচ', 'বালিকা ও দুষ্টলোক' প্রভৃতি কবিতাপাঠ ক্রমশ সামাজিকীকৃত ব্যক্তিস্বরও হয়ে উঠেছে তীব্রভাবে রাজনৈতিক।

এভাবে ধাপে ধাপে, নিজের ভেতরে ইতিহাস ও সমকালকে শুষে নিতে নিতে সাংস্কৃতিক রাজনৈতিক লৈঙ্গিক অভিব্যক্তিকে তীক্ষ্ণ জিজ্ঞাসায় বিদ্ধ করার নব্যপাঠকৃতি রচনা করেন মল্লিকা।

বিস্তৃত আলোচনার শেষ প্রান্তে দাড়িয়ে একটা কথা অবশ্যই বলতে চাই - কোনো বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গী বা উদ্দেশ্যকে ঘীরে কেউ কোনদিন কবিতা লেখে না। যদি লিখে থাকেন তবে তা শাশ্বত কবিতা হওয়ার দাবী রাখতে পারে না। কবি মল্লিকা সেনগুপ্তর ক্ষেত্রেও একথা বলতে পারি একটি বিশেষ দিককে মেলে ধরায় তার কবিতা রচনার মূলকথা নয়।

একথা সত্যিই কেবল নারীদের সমস্যাই তার কবিতার একমাত্র বিষয় নয়। সবরকম বিষয় নিয়েই তিনি লিখেছেন। এত সত্ত্বেও যদি মেয়েদের সমতা নিয়ে, গভীর মমতায় আর তীক্ষ্ণ বিশ্লেষণে কবিতা লিখলেন মল্লিকা, সেই কবিতা শাশ্বত হল। কিন্তু চিরস্থায়ী? এরকম প্রশ্ন যাঁদের আছে তাঁদের আমি 'আমাকে সরিয়ে দাও, ভালোবাসা' গ্রন্থটি একবার পড়ে দেখতে অনুরোধ করবো। রোগজর্জর মল্লিকা জীবনের প্রতি এক বিপুল ভালোবাসা আর মমতা থেকে লিখেছেন এই গ্রন্থের কবিতাগুলি। যাকে আমরা বলি গীতিকবিতা, এই গ্রন্থের কবিতাগুলিতো তাই। 'আমাকে সরিয়ে

দাও, ভালোবাসা 'পাঠ করার পর সত্যি মনে হয় পাঠক হৃদয়কে আদ্র করে তোলে যে কবিতা সে কবিতা রচনার মতো দক্ষতা ও কোমল একটা মন থাকা সত্ত্বও গীতিকবিতা মল্লিকা সেনগুপ্ত ইচ্ছা করেই রচনা করেননি। গীতিকবিতা না লিখে আসলে বাংলা কবিতায় নতুন ধরনের একটি কবিতা লেখার ধারাকে তিনি প্রতিষ্ঠা করে যেতে পেরেছেন। এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই যে বাংলা কবিতায় 'আপনি বলুন মার্কস', 'ফ্রয়েডের খোলা চিঠি' বা 'ছেলেকে হিস্ট্রি পড়াতে গিয়ে'- এর মতো কবিতা মল্লিকা সেনগুপ্তই প্রথম লিখেছেন। এই সময়ে যে সমস্ত মহিলা কবিরা কবিতা লিখছেন তাঁদের বিষয় নির্বাচনের সাহস ও ভাষা ব্যবহারের স্বচ্ছাচারিতাও অনেকটাই মল্লিকা সেনগুপ্তর কবিতাচর্চার কাছে ঋণী।

শেষ কথা একটাই। খুব নির্মম বিচারেও একথা মানতে হবে, মাত্র একান্নটি বছরের মধ্যেই মল্লিকা সেনগুপ্ত এমন একাধিক কবিতা লিখেছেন যা স্মরণযোগ্য হয়ে উঠেছে। সংবাদের শিরোনামে, প্রবন্ধের প্রারম্ভে, বক্তৃতার অন্তে একাধিকবার ইতিমধ্যেই ব্যবহৃত হয়েছে মল্লিকার কবিতার লাইন। বেশ বোঝা যাচ্ছে মল্লিকা সেনগুপ্তর যে কবিতাগুলিকে বাঙালী পাঠকের হৃদয় থেকে কিছুতেই মুছে ফেলা যাবে না তার সংখ্যা একের অধিক। আর ইতিহাসে ঠাঁই পেতে তো দরকার একটি, একটি মাত্র সার্থক কবিতা। তাই না?

তথ্যসূত্র :

১. 'কথামানবী মল্লিকা', সৃজন বিশেষ সংখ্যা, পৃ. ২৯
২. 'সিন্ধুদ্রাবিড়', মল্লিকা সেনগুপ্ত, শ্রেষ্ঠ কবিতা, দে'জ পাবলিশার্স, পৃ. ২৩
৩. 'নকশিকথা' পত্রিকা, ২০১৫, 'স্বাধীনতা উত্তর বাংলা নারী কবিতা' পৃ. ৮৯
৪. তদেব, পৃ. ৮৯
৫. সেনগুপ্ত, মল্লিকা, শ্রেষ্ঠ কবিতা, দে'জ পাবলিশার্স, পৃ. ১৩০
৬. 'নকশিকথা' পত্রিকা, ২০১৫, 'স্বাধীনতা উত্তর বাংলা নারী কবিতা' পৃ. ৮৯
৭. সেনগুপ্ত, মল্লিকা, স্ত্রীলিঙ্গ নির্মাণ, আনন্দ পাবলিশার্স, পৃ. ১১
৮. 'নকশিকথা' পত্রিকা, ২০১৫, 'স্বাধীনতা উত্তর বাংলা নারী কবিতা' পৃ. ৯০
৯. সেনগুপ্ত, মল্লিকা, শ্রেষ্ঠ কবিতা, দে'জ পাবলিশার্স, পৃ. ৪১
১০. 'কথামানবী মল্লিকা', সৃজন বিশেষ সংখ্যা, পৃ. ৪২
১১. সেনগুপ্ত, মল্লিকা, শ্রেষ্ঠ কবিতা, দে'জ পাবলিশার্স, পৃ. ১৪৭
১২. তদেব, পৃ. ১৫১
১৩. তদেব, পৃ. ১৫৪
১৪. তদেব, পৃ. ১৪৪
১৫. তদেব, পৃ. ১৬৪
১৬. তদেব, পৃ. ৯৭
১৭. তদেব, পৃ. ১০৬
১৮. তদেব, পৃ. ৭৪